আবদুর রহমান

তিন পুরুষের দই ব্যবসায় বগুড়ার একজন

আপেল মাহমুদ

বগুড়া জেলার সঙ্গে কোনও খাবারের নামটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত? যে কেউ চোখ বন্ধ করেই বলে দিতে পারে 'দই'। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদই বগুড়ার নামকে উজ্জ্বল করেনি, দইও তাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরেছে। অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে ঐতিহ্যবাহী বগুড়ার দই। বিয়ে, জন্মদিন, শ্রাদ্ধসহ এমন কোনও অনুষ্ঠান নেই যেখানে দই অনুপস্থিত। বগুড়ার দইয়ের স্বাদ গ্রহণ করেনি এমন দুর্ভাগা মানুষ বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুধু বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দইয়ের কদর কতখানি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হিন্দু সমাজেই এই ঐতিহ্যবাহী দই তৈরির প্রচলন ছিল। সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে রফাত দইঘর।

সময়টা ১৯২০ সাল। রফাতুল্লাহ সবেমাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছেন কিন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে স্কুলের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। পরিবারের আর কেউ নেই যে সংসারের হাল ধরবে। আর তাই দুচোখে সরষে ফুল দেখেন। পরিবারের সদস্যদের মুখে দুবেলা দুমুঠো খাবার তুলে দিতে গিয়ে হিমশিম খান। লেখাপড়াও তেমন করতে পারেনি বলে একটা ছোটখাটো চাকরি জুটিয়ে সংসারের কষ্ট লাঘব করবে সেই রাস্তাও বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে গুরু রাজ ঘোষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শুরু করেন দইয়ের ব্যবসা। ঘাড়ে দইয়ের ভাঁড় (বোঝা) নিয়ে গ্রামে গ্রামে ১ পয়সা, ২ পয়সায় দই বিক্রি করার মাধ্যমে শুরু হয় তার দইব্যবসা। রফাত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেও সচেতন ছিলেন না। তাই সন্তানদের জন্য কিছু রেখে যাবেন সেটা তার হয়ে ওঠেনি। ফলে এর প্রভাব পড়ে তার সন্তানদের ওপর। রফাতের কোনও ছেলেসন্তান ছিল না। তাই দই ব্যবসার দায়িত্ব অর্পিত হয় নাতি আবদুর রহমানের ওপর।

রহমানের পথচলা

যথেষ্ট ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার আবদুর রহমানের। নানার ব্যবসাকে কীভাবে ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই ছিল

রফাত দই ঘর-এর একটি শো রুম

তার একমাত্র ধ্যান। ফলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন দইব্যবসায়। সম্বল বলতে ছিল পৈতৃক সূত্রে পাওয়া কয়েক শতক জমি, মাটির কয়েকটা ঘর কাঠের কয়েকটা চৌকি, চেয়ার ও টেবিল। মাটির ঘর হলেও তা ছিল ইঁদুরের জন্য আবাসস্থল, যাতে মানুষের বাস করা ছিল দুঃসাধ্য। এই সম্বল নিয়ে এবং নানার শিখিয়ে দেওয়া পথ ধরে শুরু করেন দইয়ের ব্যবসা। পথ চলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খান। অল্প পুঁজির কারণে সহকারী হিসাবে একজন শ্রমিক নেওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। দূর-দূরান্তের গ্রামে দই বিক্রি করতে গিয়ে কত মানুষ তাকে ঠকিয়েছে, তার দই চুরি করেছে তার ঠিক নেই। আবার প্রতিবাদ করতে গিয়ে উল্টো কথা শুনতে হয়েছে তাকে। এতে ভেঙে না পড়ে সামনে এগিয়ে গেছেন নতুন উদ্যমে। দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে শত অভাব-অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সামনে অগ্রসর হয়েছেন।

কত দিন যে শুধু সিদ্ধ মিষ্টি আলু খেয়ে দিন কাটিয়েছেন তার শেষ নেই। কারণ তখন ভাতের মুখ দেখার মতো সৌভাগ্য খুবই অল্প দিনই হতো। শুধু খাবার নয়, চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তাকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আদরের মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়লে কোথাও ধরনা দিয়ে একটা টাকাও সাহায্য পাননি, অবশেষে বাধ্য হয়েছেন ঘরের টিন বিক্রি করে মেয়ের চিকিৎসা করতে।

১৯৮০ সালে আবদুর রহমান যখন দইয়ের ব্যবসা শুরু করেন তখন সমাজের কেউই তাকে সুনজরে দেখত না। সমাজের নীচুজাত ভেবে কামার-কুমারদের সঙ্গে তুলনা করে হেয় প্রতিপন্ন করত। সমাজ পরিবারের প্রতি অন্যায়-অবিচার করলেও কখনোই তার প্রতিবাদ করতে পারেননি। অসহায়ের মতো মুখ বুঁজে সব ব্যথা, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন আর অপেক্ষা করেছেন সুদিনের। অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠিন অধ্যবসায় আর কঠোর সাধনায় আবদুর রহমান আজ উত্তরবঙ্গের সফল দই ব্যবসায়ী।

নিজে সারাদিন দই বিক্রি করে তা দিয়ে গ্রাম থেকে দুধ সংগ্রহ করে সারারাত জেগে

দই তৈরি করেছেন। ক্লান্ত, অবিশ্রান্ত দেহ নিয়ে রাতে দই তৈরি করতে গিয়ে কতবার হাত-পা আগুনে পুড়েছে, সেই পোড়া চিহ্নগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

প্রথম হোঁচট থেকে শিক্ষা

সময়টা ১৯৯০ সাল। বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথায় যৌথ উদ্যোগে তার ব্যবসা শুরু করেন। ভেবেছিলেন সহযোগীর সঙ্গে ব্যবসা করায় হয়তো তার ভাগ্যের চাকা খুলে যাবে। কিন্তু তার স্বপ্ন এবং ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে সহযোগীদের অসংযত আচরণ, ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে বিতর্ক ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের দাপট। ফলে বাধ্য হন সাধের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে। উপায় না পেয়ে আবার চলে আসেন নিজ আবাসস্থল বাঘোপাড়ায় এবং নতুন উদ্যমে চালু করেন তার ছোট্ট কারখানাটি। এই সময় তিনি তার ব্যবসাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করেন এবং ব্যবসা প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আনেন নতুনত্ব। এই নতুনত্বই তার জীবনকে করেছে সহজ এবং ব্যবসাকে করেছে সমৃদ্ধ।

সফলতা

দইশিল্পে নিজেকে নিয়োজিত করে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাওয়ার কাজটা শুরু করেন আঠারো বছর আগে। তিনি শুধু দই নয়, দইয়ের পাশাপাশি ক্ষীরসা, মিষ্টি, সাদা দই, ঘি ইত্যাদি তৈরি করেন। নিজের ডেইরি ফার্মে রয়েছে ১০টি শংকর জাতের গাভী, ৫টি বকনা বাছুর ও ১টি এঁড়ে বাছুর। মাছচাষের জন্য রয়েছে বিশাল একটি পুকুর, যেখানে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ করেন। তার কারখানায় শ্রমিক প্রায় ৫৫ জন। এর মধ্যে মাটির পাত্র তৈরির জন্য কুমোর ১২ জন, দুধ সরবরাহকারী ১৪ জন, জ্বালানি কাঠ সরবরাহকারী ৭ জন ও ভ্যানচালক ৪ জন।

বর্তমানে শোরুম ৬টি। এগুলো হলো সাতমাথা মোড়, চারমাথা, ঘোড়াঘাট, বাঘোপাড়া বাজার, মোকামতলা ও মহাস্থানে। এসব শোরুমে দইয়ের ঘাটতি মেটাতে ১২ হাজার মাটির পাত্র এবং

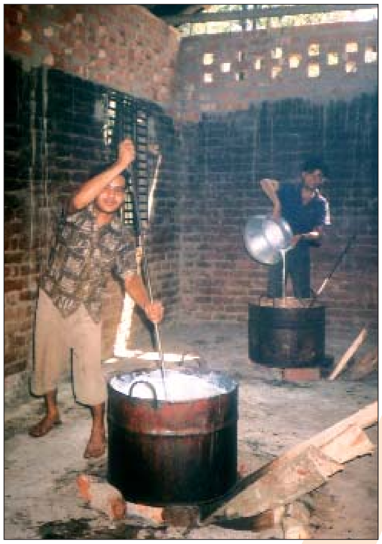

দই তৈরির কারখানা

গোয়ালদের ২৫ থেকে ২৮ মণ দুধ সাপ্লাই করতে হয়। বর্তমানে রফাতের দই সারাদেশে সুপরিচিত। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া প্রায় সব জেলাতেই সরবরাহ করা হয় তার দই। তবে সবচেয়ে বেশি সরবরাহ করা হয় ঢাকায়।

অন্য জেলা থেকে বগুড়ায় বেড়াতে এলে কেউ প্রিয়জনের জন্য উপহার বা প্রিয় খাবার হিসাবে দই নিয়ে যেতে ভোলেন না। শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও যেমন সৌদি আরব, দুবাই, আবুধাবী প্রভৃতি দেশে যাচ্ছে আবদুর রহমানের দই। তৎকালীন পাকিস্তান গভর্নরের মেয়ের বিয়েতে আপ্যায়ন করানো হয় তার দই দিয়ে। আবার সেই সময় জমিদাররা দইয়ের প্রতিযোগিতা করলে বগুড়ার দই প্রথম স্থান অধিকার করে।

বগুড়ার দইয়ের অনুকরণে সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় দই তৈরির প্রতিযোগিতা হলেও আজ পর্যন্ত কেউ আবদুর রহমানের দইয়ের স্বাদের আশপাশেও ভিড়তে পারেনি। এ ব্যাপারে রহমান বলেন, এখানে অভিজ্ঞতাই বড়। দই তৈরির উপকরণগুলো ঠিকভাবে ও পরিমাণমতো ব্যবহার করতে পারলে যেকোনও আবহাওয়ায় এবং যেকোনও জায়গায় ভালোমানের ও স্বাদের দই তৈরি করা সম্ভব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দইকে লাভজনক শিল্প হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে দইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন মিষ্টিজাত খাবার তৈরি ও উন্নতমানের লাচ্ছা সেমাই তৈরি। বড় মাপের ডেইরি ফার্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে যেখান থেকে কারখানার দুধের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। এ ছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় শাখা খোলার পরিকল্পনাও তার আছে। কীভাবে দইশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় এবং দেশের বেকারত্ব কমাতে কীভাবে দইশিল্প নিয়ে কাজ করতে পারেন এসব বিষয়ে তিনি সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেন।

সাফল্য থেকে পথদ্রষ্টা

আবদুর রহমানের দই ব্যবসার সাফল্য সারা দেশের বেকার যুবকদের মাঝে যুগান্তকারী সাড়া জাগিয়েছে। তার অনুসরণে বগুড়ায় গড়ে উঠছে অসংখ্য দই কারখানা। যে সমস্ত লোক জমিতে পিঠ পুড়ে সংসার চালাত, তারা এখন এক-একটি দই কারখানার মালিক। বাহার দইঘর, আজিরন দইঘর এবং রশিদ দইঘর এক সময় আবদুর রহমানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্যবসায় ব্যাপক প্রসার ও সুনাম অর্জন করেছে। তার অনুসরণে গড়ে ওঠা দই কারখানাগুলো ঐ এলাকায় প্রায় দুই হাজার বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে ফলে ঐ এলাকায় বেকার যুবক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বেকারত্ব হ্রাসের ব্যাপারে আবদুর রহমান বলেন, আমার খুবই ভালো লাগে যখন দেখি আমারই অনুসরণে তারা ব্যবসা করছে এবং স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছে। আমার তো তাদের কাছে চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। তাদের মুখে হাসি দেখলে আমারও ভালো লাগে।

এভাবেই আবদুর রহমান তার মেধা ও শ্রমের সাফল্যের একাগ্রতা-ঘেরা আলো ছড়িয়ে যুবসমাজকে দইশিল্পে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে একজন সার্থক পথদ্রষ্টা হিসাবে বিবেচিত হয় বগুড়া জেলার সকল মানুষের কাছে।

যেখানেই আছে দিন বদলের চেষ্টা সেখানেই আছি আমরা

banglalink™
An ORASCOM TELECOM Company